আল আশরাফ

দেয়ালিকা সাময়িকী

بسم الله الرحمن الرحيم

আল আশরাফ

মাদরাসা আশরাফুল মাদারিসের ছাত্রদের
দেয়ালিকা উপলক্ষ্যে সাহিত্য সাময়িকী

দেয়ালিকা পরিবার

- **উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধায়ক**
  শাইখ সাইয়েদ আহমাদ হাফিজাহুল্লাহ

- **দেয়ালিকা সম্পাদনা**
  উস্তায সাঈদুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ
  উস্তায ইবরাহীম খলীল হাফিজাহুল্লাহ

- **সাময়িকী সম্পাদনা**
  ইবনে আবদুস সাত্তার

- **অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা**
  জাহিদ হাসান

- **সার্বিক সহযোগিতায়**
  মাদরাসা আশরাফুল মাদারিসের ছাত্রবৃন্দ

- **প্রথম প্রকাশ**

জিলহজ্জ ১৪৪৪ হিজরী
জুলাই ২০২৩ ঈসায়ী

স্বাগত কলাম

নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম।
লেখালেখি একটি নান্দনিক শিল্প।ইসলামে লেখনীর গুরুত্ব অপরিসীম।আল্লাহ তা'আলা কলমকে মর্যাদাসম্পন্ন বস্তু হিসেবে উল্লেখ করেছেন।আর লেখক হচ্ছেন মর্যাদাশালী।আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের কতক স্থানে কলমের শপথ করেছেন।যেমন বলেছেন, 'নুন ও কলমের শপথ এবং ওই বস্তুর শপথ! যা তারা লিপিবদ্ধ করে'- (সুরা কলম : ১)।

ইসলাম বিদ্যার্থীর কলমের কালিকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখে।সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা লেখেন না, ইসলাম মনে করে, সে নিজের এবং অন্যের অধিকার নষ্ট করছেন।নিজের অধিকার নষ্টের অর্থ হলো, নিজেকে ফলপ্রসূ হওয়া থেকে বঞ্চিত করা, উত্তম কাজগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

লেখালেখির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বিশ্বখ্যাত মনীষী সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.) বলেছিলেন, 'যুগ এখন নতুন খালিদ বিন ওয়ালিদ ও নতুন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর অপেক্ষায় রয়েছে।তাদের নমুনা তো কেয়ামত পর্যন্ত আর কেউ হতে পারবে না। কিন্তু আমি শুনতে পাই, তাদের আত্মা যেন তোমাদের ডেকে বলছে, তলোয়ারের জিহাদ তো আমরা করেছি।বুকের রক্ত যত প্রয়োজন, ঢেলে দিয়েছি।যখনই ডাক এসেছে এক মুহূর্ত বিলম্ব করিনি। আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছি।কিন্তু আজ রক্তের জিহাদের যতটা প্রয়োজন, চিন্তার জিহাদের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি।ধারালো তলোয়ারের যতটা প্রয়োজন, শানিত কলমের প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি।বাতিলের বিরুদ্ধে তোমাদের আজ শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ময়দানে এবং চিন্তা-মতবাদ ও দর্শনের জগতে লড়তে হবে।কেননা নবুয়তে মুহাম্মদির ওপর এখন তলোয়ারের হামলা যতটা না চলছে, তার চেয়ে বেশি চলছে যুক্তি-দর্শনের আক্রমণ। সুতরাং নতুন যুগের নতুন জিহাদের জন্য তোমরা এক দল মুজাহিদ তৈরি হও।

লেখালেখির এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাদরাসা আশরাফুল মাদারিস কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দেয়ালিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।যার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হয়েছে।আলহামদুলিল্লাহ।সেই দুই দেয়ালিকার নির্বাচিত কিছু লেখা নিয়েই আমাদের এই সাময়িকী আয়োজন।নিজেদের কলমের ফসলকে স্মৃতির পাতায় ধরে রাখার ক্ষুদ্র প্রয়াস।আল্লাহ চাহে তো ভবিষ্যতে এই আয়োজন আরো বড় আকারে হবে।ইনশাআল্লাহ।
ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

বিয়ে একটি স্বাভাবিক এবং মানবিক প্রয়োজন।ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বের সেরা এমনকি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ অর্থাৎ নবীগণও বিয়েতে আপত্তি করেননি। আল্লাহর প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বিয়ে করেছেন এবং বিবাহকে তাঁর সুন্নত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ইসলামে বিয়ের উপর এত জোর দেওয়া সত্ত্বেও বহু বড় আলেম, ফকীহ, বিচারক, মুফতি, পণ্ডিত এবং অগণিত মনীষা সারা জীবন বিয়ে করেননি। তাদের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকজন হলেন- ইমাম ইবনু জারীর তাবারী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম নববী, আবু আলী ফারসি, আবু ইসহাক শিরাজী, আবুল কাসিম মাহমুদ বিন উমর যমখশরী, সাঈদ বিন মির্জা নুরসি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাঃ তাঁর "আল-উলামাউল উযযাব আল্লাযীনা আছারুল ইলমা আলায যাওয়াজ " গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এমন উলামায়ে কেরামের নাম ও হালত বর্ণনা করেছেন।

ইলমের ভালোবাসায় চিরকুমার উলামায়ে কেরাম
রফিকুল ইসলাম
মিশকাত ১৪৪৪হি.

প্রশ্ন হল এই আলেমগণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু তারপরও কেন এত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন? এর উত্তরে শায়খ আবু গুদ্দাহ লিখেছেন যে, এই আলেমগণ ব্যক্তিগত পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত কারণে বিয়ে করেননি। ইলম এবং বিয়ে উভয়টাই তাদের দৃষ্টিতে ভাল কাজ ছিল কিন্তু তাঁরা এর মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁরা ইলমের মধ্যে সম্পুর্ণভাবে নিমগ্ন হওয়ার জন্যই বিবাহকে পরিত্যাগ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইলম এইসব পণ্ডিতদের শিরায় গেঁথে ছিল। তাদের কাছে ইলম ছিল বাতাস ও পানির মতো। তারা বিশ্বাস করতেন তারা বিয়ের আগে ইলমের যে খিদমত করতেন বিয়ের পর ততটুকু করতে পারবেন না । তাই তাঁরা একাডেমিক ব্যস্ততার কারণে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ও স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুসরণ করতে পারেননি। এটাও সত্য যে বিয়ের পর একজন মানুষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে সে জ্ঞানের জন্য খুব কমই সময় বের করতে পারে। হজরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: “ বিয়ের আগে জ্ঞান অর্জন কর।” এটা প্রমাণ করে যে বিয়ে এবং সন্তান কোনো না কোনোভাবে জ্ঞান ও ইলমের থেকে ব্যস্ততার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খতিবে বাগদাদি তার “ আল-জামি লি আখলাকির রাবী ওয়া আদাবীস সামি’ গ্রন্থে লিখেছেন যে- “ ছাত্রকে যতদিন সম্ভব অবিবাহিত থাকতে হবে যাতে বিবাহের ব্যস্ততা এবং জীবিকা নির্বাহের চক্র তাকে শিক্ষা সমাপ্ত হতে বিভ্রান্ত না করে।” তাই যারা বিয়ের প্রয়োজন বোধ করে না তাদের বিয়ে না করাই ভালো, বিশেষ করে যে ছাত্রের একমাত্র কাজ ইলম অর্জন করা। ইমাম ইবনুল জাওযী তার সাইদুল খাতির গ্রন্থে লিখেছেন- “যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য যাত্রা শুরু করে তার যথাসম্ভব বিবাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিত।”

ঈদুল আযহা

আনোয়ার হুসাইন
মিশকাত ১৪৪৫হি.

ঈদুল আযহা অর্থ ত্যাগের উৎসব। মুমিন বান্দার জীবনে পবিত্র ঈদুল আযহা এবং কুরবানির গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ মুমিনের জীবনের একমাত্র আরাধনা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আর প্রকৃত কুরবানি তাকে অত্যন্ত দ্রুত আল্লাহর নৈকট্যে ভূষিত করে। কুরবানি শব্দের অর্থ নৈকট্য, ত্যাগ, উৎসর্গ। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই এ কুরবানি। উজহিয়্যা শব্দ ব্যবহার করে সেই পশুকে বোঝানো হয়, যা কুরবাণীর দিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জবাই করা হয়। পশু জবাই করা রসূল (সা.) প্রচলন করেননি বরং পূর্বেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু জবাই করা হতো। যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির জন্যই কুরবানীর বিধান ছিল। এমনকি পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব, আমাদের আদি পিতা আদম আঃ এর সন্তান হাবিল-কাবিলকেও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহ তা'আলা কুরবানীর আদেশ করেছিলেন।
আমাদের বর্তমানে প্রচলিত কুরবানীর ঘটনা সকল মুসলমানের জানা আছে। কিন্তু এর শিক্ষা আমরা অনেকেই জানি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কুরবানীর গোশত খাওয়ার প্রতিযোগিতাসহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী থেকে আমাদের কী শিক্ষা নেওয়া উচিত তা আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলে দিয়েছেন, "এগুলোর গোশত এবং রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা। কিন্তু পৌছে তার কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। (সূরা হজ্ব-৩৭)

কুরবানীর ঘটনার প্রকৃত শিক্ষা হল যে, ইবরাহিম আঃ নিজের সন্তানের জীবনের চেয়ে ও আল্লাহর হুকুমকে প্রাধান্য দিলেন। আল্লাহ তাআলা হুকুমের কাছে নিজের এবং তার সন্তানের জীবন তুচ্ছ করে দিলেন। হযরত ইবরাহিম সন্তানকে উৎসর্গ করে আমাদের মাঝে এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। তা হলো সর্বাগ্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। তাই এই শিক্ষা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে। সবক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলতে হবে, আল্লাহর আদেশ সবার আগে । বাকি সব পরে। যদি সবক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারি তাহলেই বুঝতে হবে যে আমরা কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাউফিক দিন। আমীন।

"আমিই হবো আমার ছাত্র এবং আমিই হবো আমার পাঠক। সুতরাং কেউ যদি আমার লেখা না পড়ে এবং তা থেকে কিছু না শেখে তাতে আমার দুঃখ কিসের! আমি আনার কাজ করে যাবো। আমি লিখবো এবং সেই লেখা আমি নিজেই পড়বো; পড়বো এবং নিজেই নিজের কাছ থেকে শিখবো!"

মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ (হাফিযাহুল্লাহ)

আল ওয়ালা ওয়াল বারা

আশিকুর রহমান
জালালাইন ১৪৪৫ হি.

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা হল ইসলামের সাথে যুক্ত একটি ধারনা। এর আক্ষরিক অর্থ হল "আনুগত্য এবং অস্বীকৃতি", যা আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং ঘৃণাকে বোঝায়।
সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের অনুভূতির দুটি দিক ছিলো।ভালোবাসা ও ঘৃণা। একটি বিষয়কে যদি মানুষ পছন্দ করে তবে এর বিপরীতধর্মী বিষয়টিকে অবশ্যই সে অপছন্দ করবে, ঘৃণা করবে। এটা মানুষের স্বভাবধর্ম। এটাই ফিতরাহ।

ভালবাসার দাবি কী?
আপনি যদি কাউকে ভালবাসেন তবে তার সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়বেন, ভালোবাসবেন, বন্ধুত্ব হবে।আর যদি কাউকে ঘৃণা করেন, তবে তার সাথে আপনার শত্রুতা থাকবে।

এই যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ইসলামী শরিয়ায় এই বিষয়কেই 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' বলা হয়। এটা শরীয়তের পরিভাষা। 'ওয়ালা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বন্ধুত্ব' এবং 'বারা' শব্দের অর্থ হলো 'শত্রুতা'। ইসলামী আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক একটি দিক হচ্ছে এই আল ওয়ালা ওয়াল বারা। আল ওয়ালা ওয়াল বারার শুদ্ধি ছাড়া কারো তাওহীদ পরিশুদ্ধ হবে না।
এটা ঈমান ও কুফরের মাঝে দ্বন্দ্বের বিষয়।একে হালকা করে দেখার কোন সুযোগ নেই।এটাই দ্বীনের ভিত্তি, এটাই মিল্লাতে ইব্রাহিমের সারকথা।
ইসলাম আপনাকে শেখায় ব্যক্তিগত কারণে নয়, পতাকার জন্য নয়, জমির জন্য নয়, বরং শত্রুতা ও ভালোবাসা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।আল্লাহর রাসূলের জন্য।আল্লাহর দ্বীনের জন্য।
যারা আল্লাহর দ্বীনের শত্রু তারা আমাদেরও শত্রু।
যারা আল্লাহর রাসূলের শত্রু তারা আমাদেরও শত্রু।
যারা আল্লাহর শত্রু তারা আমাদেরও শত্রু।
নিঃসন্দেহে আল্লাহর কথাই শেষ কথা।
সূরা মায়েদার ৫১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝
''হে মুমিনগণ! ইয়াহুদি ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম কওমকে হেদায়েত দান করেন না।'

এখানে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে কুফুর সাব্যস্ত করেছেন।আল্লাহর কাছে এই ভয়াবহ কাজ থেকে পানাহ চাই।

আল্লাহ তাআলা সূরা মুজাদালাহ ২২ নম্বর আয়াতে বলেছেন:
لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۝

"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালবাসে- হোক না এই বিরোধীরা তাদের পিতা অথবা পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ থেকে রূহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী-নালা, তাতে তারা চিরকাল থাকবে।আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল; জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সাফল্যমন্ডিত।"

যারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করে এই আয়াতে তাঁদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের নিজ দলের লোক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।আমাদের প্রকৃত আল ওয়ালা ওয়াল বারা চর্চা করার তৌফিক দান করুন। আল ওয়ালা ওয়াল বারার নামে বাড়াবাড়ি-উগ্রতা এবং ছাড়াছাড়ি-ইরজা থেকে হেফাজত করুন।আমীন।ওয়ামা আ'লাইনা ইল্লাল বালাগ।

অধঃপতন

খুবাইব ইসলাম
মিশকাত ১৪৪৪হি.

আমরা মুসলিম জাতি। শ্রেষ্ঠ জাতি। শ্রেষ্ঠ উম্মাহ। আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, শ্রেষ্ঠ জাতি তার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ভুলে অধঃপতনের প্রতিযোগীতায় নেমেছে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীসটি আজ আমাদের সমাজের বাস্তবতা হয়ে দেখা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "তোমরা পদে পদে, পূর্ববর্তী জাতি গোষ্ঠীর অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্ভে প্রবেশ করে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবারা বললেন-ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের অনুসরণ? তিনি বললেন-তারা ছাড়া আর কে?"সত্যিই তো! আমাদের চলন-বলন, উঠা-বসা, সভ্যতা-সংস্কৃতির সবকিছূই তো ঐ পশ্চিমা ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানদের থেকে ধার করা। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ছেড়ে তাদের সংস্কৃতিতেই আমরা গর্ববোধ করি।এরচে বড় অধঃপতন আর কী?
ভালো-মন্দ বাচ-বিচার না করে অন্ধভাবে অপরের ভঙ্গিমা নকল করে চলা, কোন কোন অথবা সকল কাজে অপরের হুবহু অনুকরণ করা মানুষের জন্য নিন্দনীয়।কারণ, এমন স্বভাব হল বানরের। এই জাতিই কোন প্রকার বিচার না করেই চোখ বুজে অপরের অনুকরণ করে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ, বিশেষ করে কোন মুসলিম পারে না বিজাতির কোন অসভ্য ভঙ্গিমা নকল করে চলতে। কারণ, মুসলিমের আছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আর তা বিনাশ করে অপরের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার মানেই হল, নিজেকে ধ্বংস ও বিলীন করা।কবি বলেন,
'পরের মুখে শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস,
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস?
আপনারে যে ভেঙ্গে-চুরে গড়তে চাহে পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকী সেজন, নামটা তার ক'দিন বাঁচে?
তবে কাফেরদের সর্ববিষয়ে সব রকম কাজেই যে অনুকরণ নিন্দনীয়, তা নয়।নিন্দনীয় হল সেই সব কাজের অনুকরণ করা, যা তাদের কল্পনা-প্রসূত, অমূলক ধারণা বা বিশ্বাসজনিত। যা তাদের অশ্লীলতাময় আচরণ ও অভ্যাস এবং যা নৈতিকতা-বর্জিত।যা তাদের মনগড়া

উপাসনামূলক ধর্মীয় আচার। যা তাদের ধর্মীয় বা জাতীয় প্রতীক এবং অন্য জাতি থেকে পার্থক্য নির্বাচনকারী পৃথক বৈশিষ্ট্য।আর যে বিষয়ে আমাদের শরীয়তে রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা।কারণ, তা করলে অসত্যকে সমর্থন করা হয়, যাতে হয় সত্যের অপলাপ।
আজ মুসলমানরা দুনিয়ার লোভে পড়ে হানাহানি এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছে। ইসলামী আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কাফেরদের মতো দুনিয়ার স্বার্থের পিছনে দৌড়াচ্ছে। সুন্নতী জীবন বাদ দিয়ে বিজাতীদের অনুসরণে আনন্দবোধ করছে যার ফলে আল্লাহর সাহায্য আসছে না। সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর দুশমন কাফেররা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই বলি মুমিন-মুসলমান ভায়েরা! আমাদেরকে রাসূল সা. এর আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে, ঈমানী শক্তি বাড়াতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।তাহলে আবারও মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। সারা দুনিয়ার মানুষ তাদের ইজ্জত করবে, তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতে বাধ্য হবে। ইসলাম বিজয়ী শক্তিতে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে আমাদের সকলকে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক দান করুন আমীন।

হজ্ব

আব্দুল্লাহ আল মাজিদ
মিশকাত ১৪৪৪ হি.

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। একটি মর্যাদাশীল ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি ভিত্তির একটি এবং ইসলামের অন্যতম প্রধান শি'আর, নানাবিধ শিক্ষা, তত্ত্ব ও তাৎপর্যধারণকারী এ ইবাদাতটি সামর্থ্যবানদের উপর ফরয, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ এর উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্ব করা তার জন্য অবশ্যকর্তব্য, আর যে এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি মুখাপেক্ষী নন।(আল-ইমরান-৯৩)

হজ্ব একটি ইবাদত এবং হজ্বের সফর একটি ইবাদতের সফর।এ নিছক ভ্রমণ বা পর্যটন নয়।ইসলামে তো ভ্রমণ-পর্যটনেরও রয়েছে আলাদা নীতি ও বিধান, যা রক্ষা করা ও পালন করা কর্তব্য। সুতরাং ইবাদতের সফরে আদব রক্ষা করা এবং প্রচলিত ভ্রমণ-পর্যটনের স্বেচ্ছাচার থেকে পবিত্র রাখা তো অতি জরুরি।

আর হজ্বের সকল কাজ যেন সুন্নাহ মোতাবিক হয় এজন্য প্রয়োজন ইলমের। আর তা হাসিল হয় আলিমগণের সান্নিধ্যে। এজন্য হজ্বের আগে ও হজ্বের সফরে হক্কানী আলিমের সান্নিধ্য গ্রহণ এবং হজ্বের আদব ও মাসায়িলের নিয়মিত চর্চা অতি প্রয়োজন।

হজ্বের মূল্যবান সময় অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় না করে ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনী ইলম অর্জনে মশগুল থাকা কর্তব্য। এভাবে আমাদের হজ্ব, যা এক মহান ইবাদত ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রোকন, সুসম্পন্ন হওয়ার আশা করা যায়।

বাবা

সানাউল্লাহ
হিদায়াতুন্নাহু ১৪৪৫ হি.

বাবা শব্দটি অতি ছোট, কিন্তু তার সাথে জড়িয়ে আছে হাজারো আবেগ-অনুভূতি। রয়েছে আদর, শাসন, কামনা-বাসনার এক বিরাট জগত। যা লিখতে গেলে প্রয়োজন পড়বে দুই মোড়কের এক বিশাল আয়োজনের।বাবা শব্দটি উচ্চারণ করতেই মনে এক অন্যরকম প্রশান্তি অনুভব হয়। যেন হাজারো ভালোলাগা আমার চারপাশে ঘুরপাক খায়।স্মৃতিপটে ভেসে উঠে হাজারো স্মৃতি আর রাগ অভিমান, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নানাচিত্র। যেমন: পড়ন্ত বিকেলে গোধুলী বেলার খেলার সাথি,ভোর বিহানে শিশির ভেজা ঘাসে মৃদু বাতাসে চলার সঙ্গী। জানা অজানা শত বিষয়ের শিক্ষক।নানা চাহিদা কামনা পূরণকারী।বাবা মানে আরো কত কিছু।এ যেন ভালোবাসার নাম।শুধু মানব মনেই না।বরং আল্লাহ তা'আলার কাছেও এক বাবার মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে নিজের অধিকারের পর পিতা মাতার অধিকারের কথা বলেছেন। বলেছেন তাদের সেবা করার কথা। ইরশাদ হচ্ছে- "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো।তার সাথে কোন কিছু শরিক করিও না, আর পিতা মাতার সাথে উত্তম আচরণ করো।' (সূরা নিসা-৩৬)

গীবত

সিয়াম মল্লিক
হিদায়াতুন্নাহু ১৪৪৫ হি.

গীবত হলো পরনিন্দা করা, পিছনে পিছনে একজনের অগোচরে . মানুষের সম্মুখে তার দোষচর্চা করা।এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।'

গীবতের পরিণতি খুবই ভয়াবহ, আমি কারো দূর্নাম করলাম, মন্দ বললাম, হেয় করলাম। এতেই কি শেষ? না। এ ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে কঠিন সতর্কবার্তা এসেছে।রাসূল বলেছেন-"গীবত যিনার থেকেও মারাত্মক। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলতেন-“কেউ যদি আমার গীবত করে,তাহলে আমি খুশী হই।কারণ এতে তার ভালো আমলগুলো আমার আমল নামায় এবং আমার খারাপ আমলগুলো তার আমলনামায় চলে যাবে।' গীবত এমন এক গুণাহ, যা অনিচ্ছায় কীভাবে যে আমাদের দ্বারা হয়ে যায় তা আমরা টেরই পাই না। তাই এর জন্য প্রয়োজন অধিক সাবধানতা ও সতর্কতা। তাহলেই এর বিষক্রিয়া থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

কওমী মাদরাসা

সফিউল্লাহ সা'দী
শরহে বেকায়া ১৪৪৫ হি.

কওমি মাদ্রাসা।দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এ নাম।এ নাম বড় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক।ইখলাস, লিল্লাহিয়াত ও তাকওয়ার সমন্বয়ে সমন্বিত।ঐশী চেতনা ও বিশ্বাসের বাতিঘর।কল্যাণকর রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের নেপথ্য কারিগর। আদর্শ ব্যক্তি গঠনের বিশ্বস্ত কেন্দ্র। বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির জোয়ারকে চপেটাঘাত করে নববী মানহাজকে নিয়ে এগিয়ে চলা এক দুর্গের নাম কওমি মাদ্রাসা.এ শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করে সভ্যতাকে বিকশিত করে, আধার দূর করে আলোর পথ দেখায়, বিচার বিবেচনা বোধ সৃষ্টি করে ভালো মন্দের মাঝে দেয়াল টানিয়ে দেয়।হৃদয় জানালা খুলে দিয়ে নীতি-নৈতিকতার পথ দেখায়।সর্বোপরি আদর্শ ও কল্যাণকর সমাজ গঠনে মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এ সকল কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা। এখানে রাত দিন তাওহীদ ও রিসালাতের সুমহান বাণী শিক্ষা দেওয়া হয়, সকাল সন্ধ্যা আখিরাতের সরল পাঠদান করা হয়।হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নববী আখলাকের নীতি ও নৈতিকতার গুণগুলো।কওমী মাদ্রাসা নতুন কিছু না বরং হেরা গুহার যে নূর আসহাবে সুফফার মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় সেই নূরের ধারক বাহক রূপে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের এ সকল কওমী মাদরাসা।সেই নূরের পূর্ণ চেতনাকে বুকে লালন করে ডালিম গাছের ছায়ায় দারুল উলুম দেওবন্দ নামে শুরু হওয়া এ ধারা আজ ছড়িয়ে পড়েছে পৃঊ পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেওবন্দী শিক্ষাধারা অনুসরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমাদের বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান যেগুলো শান্তিময় ও কল্যাণকর সমাজ এবং আদর্শ জাতি গঠনে বিরাট ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

সদকাহ

আবু উবায়দা
মিশকাত ১৪৪৫ হি.

দান-সাদাকাহ মুমিনের অন্যতম একটি গুণ।দানের মাধ্যমে মানুষের বালা মুসিবত দূর হয়। দান-সাদাকা মানুষের পাপ মিটিয়ে দেয়। দান করার মাধ্যমে মানুষের মহৎ গুণ প্রকাশ পায়।সমাজে অনেক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে। তাদেরকে দান করার মাধ্যমে তাদের দুঃখে পাশে দাড়ানো যায়। তাদেরকে খুশি করা যায়, যা একটি মহৎ গুন।দান-সাদাকায় মানুষ কবরের উত্তাপ যেমন ঠান্ডা হয়ে যায়। তেমনি কেয়ামতের কঠিন ময়দানে দান-সাদাকাকারী আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে।

দান-সদকা মুমিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষঙ্গ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে দান-সদকার অনেক ফযীলতের কথা। দান করলে বিপদাপদ দূর হয়। দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধকে নিভিয়ে দেয়। দানের প্রতিদানকে আল্লাহ তায়ালা সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন, এমনকি কাউকে আরও বেশি পরিমাণে নেকি দিয়ে থাকেন-কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত এসব কথা আমাদের মুখে মুখে বেশ প্রচলিত।

তাই আসুন! আমরা সবাই কৃপণতা ভুলে যার যার সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মানবতার কল্যাণে বেশি বেশি দান-সদকাহ করি। আল্লাহ আমাদের দাতা হিসেবে কবুল করুন। জান্নাত আমাদের কাছে এনে দিন। জাহান্নাম দূরে সরিয়ে নিন।

চাহাত
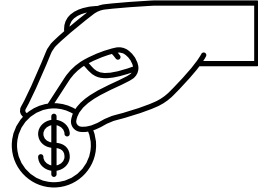
জাহিদ হাসান
মিশকাত ১৪৪৫ হি.

যখনই সাধ জাগত তিনি চলে যেতেন দ্যুতিময়, সৌম্য-শান্ত আলোর আভায় আলোকিত মানুষটির সংস্পর্শে।অশান্ত হৃদয়ের অনন্ত পিয়াস মিটাতেন তাঁর চাঁদমুখ দর্শনে।তৃপ্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরতেন, যেন আঁজলা ভরে আবে হায়াত পিয়েছেন।কিন্তু আজ! আজ এক আগত বিচ্ছেদের বিরহ-বার্তায় তিনি বেশ চিন্তিত।যেই বার্তা হৃদয়ে সাইক্লোন বইয়ে দেয়।নিজের পরানের চেয়েও যাঁর মিষ্টি-হাসি অধিক প্রিয়, আজ তাঁর দেখা নেই।কোথায় তিনি।অল্প মুহূর্তের এ বিরহে তাঁর সোনামুখ বেদনায় নীল হয়ে যায়।

কিছু সময় পর ফেরেন তিনি। অবলোকন করেন তাঁর এক আশেকের বিরহ-চিত্র। কাছে গিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে জানতে চান-কী হয়েছে তোমার? উজ্জ্বল মুখ কেন বেদনায় নীল? তিনি কান্নার কাঁপন তুলে বলে যান তাঁর প্রেমের আখ্যান - "আপনি তো জানেন আপনাকে কত ভালোবাসি। আপনার ভালোবাসার অবাধ জলধারায় অবগাহন করে আমি মধুময় ক্ষণ পার করি আপনার পবিত্র আঙিনায়।আজ কিছু সময় আপনার অনুপস্থিতিতে আমার হৃদয়ে বিরহের বিক্ষুব্ধ ঝড় ওঠে।আমি তখন ভাবতে থাকি কী হবে ওপারে? আপনি থাকবেন জান্নাতের সুমহান এক স্থানে।যদিও আমি রবের দয়ায় পেয়ে যাই জান্নাত, আপনার সুমহান স্থানে আলোকিত মজমায় বসার সুযোগ কি হবে?"

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব।এ গভীর প্রেমের প্রতিটি শব্দে নাড়া দেয় তাঁর ভাবনার শিকড়।খুলে যায় আসমানের দুয়ার।শত ডানায় ভর করে জমিনে নেমে আসেন আকাশের দূত রুহুল আমিন।নিয়ে আসেন একক অধিপতি মহান রবের পবিত্র কালাম।পড়ে শোনান প্রিয়তম মানুষটির সাথে অনন্তকালের জন্য বসবাসের দস্তক।তাঁর চোখে মুখে খেলে যায় অপার্থিব খুশির দ্যুতি। মুমিনের অনন্তকালের বাসস্থান জান্নাতে তিনি থাকবেন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাহি সাল্লামের পাশে।তাঁর পবিত্র মুখ তারিয়ে তারিয়ে দেখে চক্ষু শীতল করবেন।তিনি সাওবান সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু।

দুঃস্বপ্নের রাতে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল ভূমিতে খুঁজে চলি সাওবানের ধ্রুব প্রেমের তেজস্বী ঘোড়া।তাঁর এ গভীর ভালোবাসার আখ্যানে আন্দোলিত হয় আমার হৃদয়ের সঞ্চিত নিখাদ ভালোবাসা।জান্নাতে নবীজির সঙ্গলাভের ব্যাকুলতায় তড়পাই।মনে আশার চাঁদ জ্বেলে অশ্রুর ফোঁটায় ফোঁটায় মহান রবের কাছে পেশ করি আমার আত্মার আর্তি।আমার দিলের চাহাত।

তাওহীদ

আবু রায়হান
হিদায়াতুন্নাহু ১৪৪৫হি.

তাওহিদ মানে হলো আল্লাহ তাআলাকে এক বলে বিশ্বাস করা তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মালিক নেই।এ বিষয়ের উপর আহ্বান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,"বল, তিনি এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে এবং কেউ তাকে জন্ম দেননি।এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

এমনিভাবে কোন কাফের বা অমুসলিম যদি ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে সর্বপ্রথম তার কর্তব্য হলো কালিমায়ে তাওহিদ বা কালিমায়ে শাহাদাত পড়া। মুখ দিয়ে এই সাক্ষ্য দেয়া এবং অন্তরে বিশ্বাস করা যে,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

তাওহিদের বিপরিত হলো শিরক। ইসলামে শিরক বলা হয়, আল্লাহর যাত, সিফাত ও ইবাদতে কাউকে সমকক্ষ, অংশীদার বা উপযুক্ত মনে করা।কোন ব্যক্তির তাওহিদ যদি ঠিক না থাকে।জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল কাজে যদি আল্লাহকে এক মনে না করে তাহলে সে মুমিন হতে পারবে না। পরকালে সে মুক্তি পাবে না।

কৃপণতা

শাকিল আহমেদ
নাহবেমীর ১৪৪৫ হি.

কৃপনতা একটি মন্দ স্বভাব একটি আত্মিক রোগ। যা শুধু মানুষের অভাবকেই বাড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধি করে দেয় মনের হাজারো আফসোস। একজন কৃপন কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারেনা।তার পেট ভরলেও চোখ ভরেনা।তার অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পুরা দুনিয়াটা পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেও তার পেট ভরবেনা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃপনতাকে মারাত্মক রোগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন - কৃপণতার চেয়ে মারাত্মক রোগ আর কি হতে পারে?

অতিরিক্ত লোভ লালসা থেকে মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ লোভ-লালসা মানুষকে পাপাচারে ডুবিয়ে দেয়, যা সফলতার চেয়ে ধ্বংসই বেশী ডেকে আনে ।এই কৃপনতা পূর্ববর্তী অনেক জাতীয় ধ্বংসের কারণ হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, "তোমরা কৃপনতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপনতার কারণে ধ্বংস হয়েছে।' (আবু দাউদ, হাদিস-১৯৬৬)
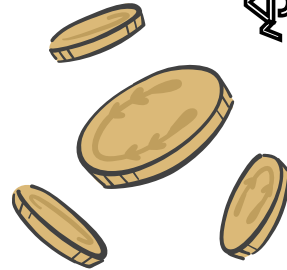
কবিতা কানন

নামায

নূর মোহাম্মদ
হিদায়াতুন্নাহু ১৪৪৫ হি.

নামায পড় মুসলিম ভাই
নামায ছাড়া শান্তি নাই।
নামায় ছেড়ে করিও না ভুল
নামায হলো শান্তির মূল।

নামাযে আছে শান্তি-সুখ
নামায পড়লে দূর হয় দুখ,
নামায হলো জান্নাতের চাবি
তাইতো মোরা নামায পড়ি।

তুমি আমার না হলে মা
কোথায় পেতাম আদর
মাঘের শীতে আমার গায়ে
কে দিত মা চাদর?

তোমার কোলে না ঘুমালে
কে বা দিত ঠাই?
তাইতো মাগো দূরে থেকেও
তোমায় কাছে পাই

মা

আল আমীন
হিদায়াতুন্নাহু ১৪৪৫ হি.

আমারে সকল ক্ষুদ্রতা হতে
বাঁচাও প্রভু উদার।
হে প্রভু! শেখাও – নীচতার চেয়ে
নীচ পাপ নাহি আর।

যদি শতেক জন্ম পাপে হই পাপী,
যুগ-যুগান্ত নরকেও যাপি,
জানি জানি প্রভু, তারও আছে ক্ষমা-
ক্ষমা নাহি নীচতার॥

ক্ষুদ্র করো না হে প্রভু আমার
হৃদয়ের পরিসর,
যেন সম ঠাঁই পায়
শত্রু-মিত্র-পর।

নিন্দা না করি ঈর্ষায় কারো
অন্যের সুখে সুখ পাই আরো,
কাঁদি তারি তরে অশেষ দুঃখী
ক্ষুদ্র আত্মা তার॥